প্লিজ, সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলুন

শেখ হাসিনা

গত কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি ব্যাপকভাবে রাজনীতিবিদদের চরিত্র হনন চলছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সবই বলা হচ্ছে ঢালাওভাবে। খুবই খুশি হতাম যদি ঢালাওভাবে না বলে ব্যক্তি, দল, দলের জন্মসূত্র, ক্ষমতা, ক্ষমতায় যাবার পূর্বে কার কি সম্পত্তি ছিল, পরে কত বৃদ্ধি হলো, কে কোন্ পেশা থেকে রাজনীতিতে এসেছে, ক্ষমতায় থাকতে কে কিভাবে দেশ চালিয়েছে, দেশের মানুষ কি পেয়েছে ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হতো তাহলে কোন কথা থাকত না। কিন্তু তা কিছুই করা হচ্ছে না।

তবে এটা নতুন কিছু নয়, যারা রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলে এবং রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে তারাই আবার পরবর্তী সময়ে রাজনীতিতে অবতরণ করেন এবং রাজনীতিবিদ হয়ে যান।

আমার প্রশ্ন হলো– রাজনীতিবিদদের হেয় করার এ প্রবণতা কার স্বার্থে? এর একটা প্রশ্নও আছে সেটা হলো রাজনীতিবিদদের সংজ্ঞা কি? কাদের রাজনীতিবিদ বলবেন? কাদের বলবেন না? বড় বিচিত্র এ দেশ! মাঝে মাঝেই আমার মনে প্রশ্ন আসে– আমি তো রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম নিয়েছি। দেখেছি দেশের স্বার্থে আত্মত্যাগ, জেল জুলুম নির্যাতন সহ্য করা। বাবার হাত ধরে যখন স্কুলে যাবার কথা তখন মায়ের হাত ধরে জেলগেটে যেতে হয়েছে বন্দী বাবাকে দেখতে। অনেক সময় পিতা জেলে বলে লেখাপড়া বন্ধ হয়েছে, স্কুল বন্ধ হয়েছে। আমাদের প্রজন্মের অনেককেই এই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পাড়ি দিতে হয়েছে শৈশব, কৈশোর আর তারুণ্যের দিনগুলো। এই আত্মত্যাগ যারা করেছেন তাদেরই অর্জন হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। কিন্তু সেই বাংলাদেশেই তো এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের হত্যা করা হয়েছে নির্মমভাবে। হত্যার পূর্বে পরিকল্পিতভাবে বদনাম ছড়ানো হয়েছে, মিথ্যা অপপ্রচার করা হয়েছে। মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। আর হত্যার অজুহাত নেয়া হয়েছে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে, দুর্নাম রটিয়ে। হত্যাকাণ্ডের মতো চরম জঘন্য ঘটনাকে জায়েজ করার জন্য রাজনীতিবিদদের চরিত্র হনন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে উনিশটি ক্যু হয়েছে সামরিক বাহিনীতে। হাজার হাজার হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। কত মায়ের কোল খালি হয়েছে, কত বোন বিধবা হয়েছে। সন্তান পিতাহারা হয়েছে।

১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে এবং ৩ নবেম্বর চার জাতীয় নেতাকে কারাগারে হত্যা করে যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা তো বলেছিল অনেক দুর্নীতি হয়েছে, তাই এ ঘটনা ঘটেছে। একত্রিশ বছর হয়ে গেছে এ পর্যন্ত একটা দুর্নীতি বা কোন অনিয়ম হয়েছে তা কি প্রমাণ করতে পেরেছে? পারেনি কিন্তু অপপ্রচার তো ব্যাপকভাবে করা হয়েছিল। যারা এই মিথ্যাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের বিরুদ্ধেও তো কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। কিন্তু রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে কথা বলে যারা ক্ষমতা দখল করেছিল অবৈধভাবে, তাদের ভূমিকা কি ছিল?

জেনারেল জিয়া নিজেকে নিজেই রাষ্ট্রপতি বানিয়েছিল অস্ত্রের জোরে আর উর্দি খুলে সাফারি স্যুট পরে রাজনীতিবিদ হয়েছিল। তার বক্তব্য ছিল 'অ ষধফফ বটপণ যমফর্ধধড্র ঢধততধডলর্ফ তমর্দণ যমফর্ধধডধটভ্র.' এবং ঠিকই সে তা করেছে। আজকের অবস্থাটা যখন পর্যবেক্ষণ করি তখন যে কথাটা বার বার মনে হয় সত্যিই ত্যাগী নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের জন্য রাজনীতি অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে গেছে। ইদানীং এমন এমন মানুষের কাছ থেকে সমালোচনা শুনতে হয় যাদের অতীত ইতিহাস, অর্থসম্পদের মালিক হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে কিন্তু স্বচ্ছতা নেই, জবাবদিহিতা নেই। আর যখন বলেন, তখন তা ঢালাওভাবে বলেন। সাদাকে সাদা বলেন না বা কালোকে কালো বলেন না। মনে হয় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বলেন। ধোঁয়াটে ভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বলেন।

আমার কথা স্পষ্ট। যখন কথা উঠেছে তখন কোন দলের জন্ম কীভাবে হলো, তাদের কার্যক্রম কি, ক্ষমতায় থেকে কোন দলের সময় কতজন কত সম্পদের মালিক হয়েছে তা অবশ্যই পরিষ্কারভাবে অঙ্কের মতো হিসাব দিয়ে বলতে হবে। শুধু তাই না, কোন সরকারের কাছ থেকে কে কতটুকু সুবিধা নিয়েছেন, কে কোন ব্যবসাটা নিয়েছেন যার বদৌলতে সমাজের বিশেষ স্থানে স্থান করে নিতে পেরেছেন, তাও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করুন যদি সৎসাহস থাকে।

রাজনীতি, সৎ ও যোগ্য প্রার্থী, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, কালো টাকার প্রভাব ইত্যাদি বিষয় আজ আলোচনায় উঠে এসেছে দেখে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই আনন্দিত। এর পিছনে একটা কারণও আছে। যে কথাটা আজ একত্রিশ বছর পর সকলে উপলব্ধি করলেন সে কথাটা কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে জাতির জনক উপলব্ধি করেছিলেন। আর সে কারণেই সাময়িকভাবে একটা পরিবর্তনও এনেছিলেন। কিন্তু তখন তা কেউই দূরদর্শিতার অভাবে বুঝতে পারেনি। অথবা হতে পারে স্বাধীনতাকে অর্থহীন করার জন্য কোন ষড়যন্ত্র এর পিছনে ছিল, তাই তা কার্যকর করতে দেয়নি।

নির্বাচনে যাতে কালো টাকা ও সন্ত্রাসীরা প্রভাব ফেলতে না পারে তার জন্যই নির্বাচন পদ্ধতিতে একটা পরিবর্তন আনা হয়েছিল। তা হলো, প্রার্থী যারা হবে তাদের পোস্টার সরকার করে দেবে। নির্বাচনের সব খরচ জাতীয় সরকার বহন করবে। প্রার্থী শুধু বাড়ি বাড়ি যেতে পারবে। সভা-সমাবেশ একসাথে করতে পারবে। একই মঞ্চে দাঁড়াবে। এজন্য সরকার ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু যাবতীয় খরচ সরকার বহন করবে নিরপেক্ষভাবে। এভাবে দুটো উপনির্বাচন হয়। কিশোরগঞ্জে উপনির্বাচনে একজন স্কুল শিক্ষক জয়ী হন। উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাই হেরে যান। ক্ষমতায় ছিলেন বলে ভাইকে জেতাতে কারচুপিও করেননি, ক্ষমতার প্রভাবও খাটাননি।

জাতীয় সংসদে বিল এনে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করা হয় এবং জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। সেখানে সংসদ সদস্য যারা হতে পারেননি সেই সকল দল প্রশাসন, সেনাবাহিনীসহ সকল শ্রেণী-পেশাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব দেয়া হয়েছিল। এটা করার উদ্দেশ্য ছিল সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা। আর এর শুভফল দেশের মানুষ পেতে শুরু করেছিল।

আমি এ পরিবর্তনের পর আব্বাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কেন পরিবর্তন করলেন, আমি যে উত্তরটা পেয়েছিলাম তাই এখানে তুলে ধরছি। তিনি বলেছিলেন, "আমরা দীর্ঘ সংগ্রাম করেছি, বিপ্লব করেছি, গেরিলাযুদ্ধ করেছি, বিজয় অর্জন করেছি। যে কোন বিপ্লবের পর সমাজে একটা বিবর্তন আসে। হঠাৎ করে অনেকের হাতে অর্থ এসে যায়। গেরিলাযুদ্ধ করার কারণে যেখানে সেখানে অস্ত্র ছড়িয়ে

থাকে। নির্বাচনে অর্থ ও অস্ত্রের প্রভাব যাতে না থাকে, তৃণমূল থেকে সত্যিকার ত্যাগী দেশপ্রেমিক প্রার্থী যাতে জয়ী হতে পারে তার জন্য এই পরিবর্তন। একটা নির্বাচন হলে, এ থেকে এই সৎ মানুষগুলো নির্বাচিত হয়ে আসলে আর কোন অসুবিধা হবে না, আমরা আবার সংবিধান পরিবর্তন করে সংসদীয় পদ্ধতিতে চলে যেতে পারব।" এখন মনে হয় একত্রিশ বছর আগে যে কথাটা তিনি বলেছিলেন আর সত্যিই যদি সেই পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদের একটা নির্বাচন হতো তাহলে আজকের বাংলাদেশের এ অবস্থা হতো না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা সব পাল্টে দেয়।

সংবিধান স্থগিত করে গণতন্ত্র হত্যা করা হয় মার্শাল ল' জারি করে, মৌলিক অধিকার হরণ করে। বাংলাদেশের জনগণের জন্য দুর্ভাগ্য। নির্বাচন হয়েছিল পরবর্তী সময়ে, কিন্তু কি সে নির্বাচন? অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীর উর্দি খোলার জন্য এবং ক্ষমতা বৈধ করার জন্য কারচুপির মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশ সিট দখলের নির্বাচন। জনগণের কোন ভূমিকা ছিল না। ভোট দেবার অধিকারও ছিল না। কারণ ফলাফল তৈরিই ছিল। আমি ১৯৭৮ সালের রেফারেন্ডাম বা হ্যাঁ-না ভোট, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনের কথাই বলছি। সেই যে বাংলাদেশের জনগণ ভোটের অধিকার হারাল আজও ঘুরেফিরে সেই ভোগান্তিতে ভুগতে হচ্ছে। একবার একটু নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পায় তো আবার সেই দমবন্ধ পরিবেশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয়, ১৯৭৩ সালে সেই সংবিধানের ভিত্তিতে নির্বাচন হয়। ১৯৭৫ সালে হত্যা-ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার পরিবর্তন আর হয়নি কেবল ২০০১ সাল ছাড়া।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে পাঁচ বছর সফলতার সঙ্গে দেশ চালায়। এই পাঁচ বছর বাংলাদেশের জনগণের জন্য ছিল স্বর্ণযুগ। শত বাধা, ষড়যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশের মানুষ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল। একটি সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যেমন কম ছিল তেমনি আয়ও বৃদ্ধি হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকার শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। এর কারণ হলো আওয়ামী লীগ কখনই যেনতেনভাবে ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়নি। জনগণের ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করে। জনগণের কল্যাণেই রাজনীতি করে আর তাই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে দেশের সাধারণ মানুষ কিছু পায়। স্বাধীনতার ছত্রিশ বছরে আওয়ামী লীগ তো মাত্র সাড়ে নয় বছর ক্ষমতায় ছিল, স্বাধীনতা, সংবিধান, যা কিছু পেয়েছে এই দলটিই দিয়েছে। দু'বেলা ভাত থেকে শুরু করে সবার হাতে হাতে মোবাইল ফোন বা সস্তায় কম্পিউটার–তাও আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য করেছে। আওয়ামী লীগ নিঃস্বার্থভাবে সেবক হিসাবে কাজ করেছে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল।

তাই আইয়ুব, ইয়াহিয়া, জিয়া, এরশাদ, খালেদা সকলেই নানাভাবে আওয়ামী লীগ সংগঠনকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে। হাজার হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করেও এ দলটিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। শত অপপ্রচার করেও জনগণের হৃদয়ে আওয়ামী লীগের যে স্থান তা সরাতে পারেনি। এখনও জনগণের মনে আস্থা-বিশ্বাসের স্থানটা এই দলটিরই আছে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বার বার কুয়াশা সৃষ্টি করেছে আবার তা কেটে গেছে। কত মিথ্যা কথা প্রচার করা হয়েছে, যা এখনও চলছে।

যারা দুই দল, বিএনপি ও আওয়ামী লীগকে এক পাল্লায় ফেলেন তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, এই দু'দলের জন্মসূত্র থেকে শুরু করে প্রতিটি কার্যক্রম কি পরিষ্কারভাবে বলবেন? আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালে ভাষা আন্দোলন ও জনগণের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জন্মগ্রহণ করে। এই দল ক্ষমতাসীনদের দ্বারা উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে গঠিত দল নয়। বরং ক্ষমতাসীনদের অন্যায়, অবিচার শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসাবে আওয়ামী লীগের জন্ম।

বিএনপির জন্ম অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী উচ্চাভিলাষী এক সামরিক কর্মকর্তার হাতে। স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে সরকারী অর্থ ব্যয় করে এই দল গঠন করেছিল– দল করতে যারা এসেছিল তারা ত্যাগের মনোভাব নিয়ে আসেনি বরং ক্ষমতা ভোগের জন্যই এসেছিল। যার কারণে দুর্নীতি ও ঋণখেলাপী কালচার আর বিএনপির জন্ম যেন একই সূত্রে গাঁথা।

যারা ক্ষমতা দখল করে ভোগের জন্য তারা নিতেই জানে, দিতে জানে না। তাই জনগণ পায় না কিছু, শুধু কষ্টই পায়। আঙুল ফুলে কলাগাছ হয় কিছু লোক। ভাগ্য গড়ে কিছু মানুষ। এ ক্ষমতায় বসে দল করার নেতিবাচক ফল হলো মেধাবী ছাত্রদের হাতে অস্ত্র, ড্রাগ, কালো টাকা দিয়ে ছাত্রসমাজের চরিত্র হনন। ফলাফল হচ্ছে যুবসমাজকে অসামাজিক কাজে যুক্ত করা, নীতিহীন আদর্শহীন ভোগবিলাসের জীবনে অভ্যস্ত করে দিয়ে সমাজকে কলুষিত করা।

এসব কারণে বাংলাদেশ সামনে এগুতে পারেনি। বার বার হোঁচট খেয়েছে। বার বার অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখল হয়েছে আর মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। আন্দোলন করে, সংগ্রাম করে, রক্ত দিয়ে গণতন্ত্র উদ্ধার হয়েছে আবার ক্ষমতার লোভ তা কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছে।

২০০৬ সালে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে যে আন্দোলন করেছি এবং নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছিলাম তা সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল, কেবল বিএনপি-জামায়াত জোট ছাড়া।

যেসব দাবি-দাওয়া নিয়ে আমরা গণআন্দোলন করেছিলাম তার যৌক্তিকতা আন্দোলনের সফলতার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের দাবি-দাওয়ার বাস্তবায়ন করার কথা বলে আবার আমাদেরই নেতাদের অহেতুক সমালোচনা করা, জনগণের কাছে হেয় করা কেন? সমস্যাগুলো তো আগে থেকেই ছিল। আজ যারা এত সমালোচনা করে সবাইকে এক পাল্লায় ফেলছেন, তারা তো এই সমস্যার বিষয়গুলো বা সংস্কারের বিষয়ে কথা বলেননি। বরং অনেকে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করেছেন কিন্তু দায়িত্বে থাকতে সমস্যাগুলো সমাধানের কোন উৎসাহ দেখাননি। ২০০১ সালের নির্বাচনটা যদি সত্যিকারভাবে নিরপেক্ষ হতো তাহলে আজ আর এই সমস্যা সৃষ্টি হতো না, মানুষের এই ভোগান্তি হতো না। আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না এই ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এমন এক দানব বসিয়ে দিলেন ক্ষমতায় যে, বাংলাদেশকে তারা একেবারে ফোকলা করে দিল। আর ঐ দানবদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করা কি সমীচীন?

অনেক আন্দোলন সংগ্রাম ও মহাজোটের নেতা-কর্মী বিশেষ করে আওয়ামী লীগের অগণিত নেতা-কর্মীর সফল আন্দোলনের ফসল বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আমাদের দাবি-দাওয়া ও আন্দোলনে জনমর্থন ছিল বিপুলভাবে। ২০০১ সালেই কেবল আওয়ামী লীগ শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। এছাড়া আর কখনও শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর হয়নি। এই আন্দোলনে ৬৮ জন নেতা-কর্মী শাহাদাৎবরণ করেছে। পুলিশের সাথে সাথে বিএনপি ও জামায়াতের সন্ত্রাসী ক্যাডাররাও আক্রমণ করেছে। ঢাকা শহরে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের ভেতর থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে জামায়াত ক্যাডার এসে আক্রমণ করেছে। বলেছে, 'বৃষ্টির মতো গুলি কর, মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী,' গুলি করে তারা যুবলীগ নেতাকে হত্যা করেছে। তারপরও মানুষ সাহস হারায়নি। সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন তখনই সফল হয় যখন সাধারণ মানুষ সম্পৃক্ত হয়ে তাকে গণআন্দোলনে পরিণত করে।

যে দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছি তার যৌক্তিকতাও প্রমাণিত হয়েছে। এত ত্যাগ-তিতিক্ষার ফসল বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার। একজন উপদেষ্টা একটা উক্তি করেছেন, 'ব্যবসায়ীদের ধরা যাবে না অর্থনীতি অচল হয়ে যাবে।'

তাহলে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন কিভাবে?

: এরপর কি বলবেন, শুধু রাজনীতিবিদরাই দায়ী হবে? এটা কিসের আলামত?

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে যে, একটা দলে তো সকল পেশার প্রতিনিধি থাকে। তাদেরকে কি হিসাবে দেখবেন। যদি এদের কেউ দুর্নীতি করে তা হলে কি হিসাবে গণ্য হবে যে যে পেশা থেকে এসেছে সেই পেশার ব্যক্তি হিসাবে না শুধু রাজনীতিবিদ হিসাবে?

ব্যবসায়ীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে না, কারণ অর্থনীতি অচল হয়ে যাবে–একজন উপদেষ্টার উক্তি। প্রশ্ন উঠতে পারে–

- প্রশাসনের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে না, কারণ প্রশাসন অচল হয়ে যাবে।
- দুর্নীতিবাজ জজ ও আইনজীবীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে না–কোর্টকাছারি বন্ধ হয়ে যাবে।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে না–অচল হয়ে যাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ব্যবস্থা।

বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত–

- এনজিওদের ধরা যাবে না, কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে।
- ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে না, হাসপাতাল ও ক্লিনিক অচল হয়ে যাবে।
- শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে যাবে।
- সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে না, সংবাদপত্র অচল হয়ে যাবে।

এভাবে যদি এক একটা কথা ওঠে তাহলে রাজনীতিবিদরাই শুধু অপরাধী, তাদের বিরুদ্ধেই কেবল ব্যবস্থা নেয়া হবে? তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে, পূর্বে যাদের কথা বললাম তাদের মধ্য থেকেই তো আবার অনেকে রাজনীতিবিদ হয়। এরা সংগঠন করে, সংসদ সদস্য হয়, মন্ত্রী হয় আবার দুর্নীতিও করে। এদেরকে কি হিসাবে দেখবেন? আইনজীবী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, আমলা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এনজিও নেতা ইত্যাদি কি হিসাবে চিহ্নিত হবে?

কোন্ রাজনীতিবিদ তাহলে অপরাধী? যারা জনগণের দাবি-দাওয়া নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় আন্দোলন করবে, পুলিশের বাড়ি, গুলি টিয়ারগ্যাস, বোমা, গ্রেনেড, হামলা, জেল-জুলুম অত্যাচার সহ্য করবে, ছেলেমেয়ে স্ত্রীকে সময় দেবে না, আর্থিক সচ্ছলতা দেবে না, সারা জীবন ত্যাগ স্বীকার করে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করবে। ক্ষমতায় বসাবে আর বসেই ঐ মাঠের মানুষদের ওপর খড়গহস্ত হবে আর নীতিকথা শোনাবে! এটা তো প্রতারণার শামিল।

অপরদিকে যারা নিজের জীবনকে আগে প্রতিষ্ঠিত করবে, গায়ে ধুলা ময়লা লাগতে দেবে না। কোনদিন লাঠির আঘাত তো দূরের কথা, এতটুকু রোদের তাপও গায়ে লাগাবে না, আর্থিক প্রতিপত্তি বাড়িয়ে সমাজে নিজের স্থানটা করে তারপর রাজনীতিতে নেতা হতে নামবে শুধু ক্ষমতার ভোগদখল করার জন্য। এই শ্রেণীর রাজনীতিবিদের আওয়াজটা বড় উঁচু হয়। কারণ তারা তো আখের গুছিয়ে নামেন। তরতাজা থাকেন। পোড় খাওয়া নয়। আর এদের দিয়ে দেশের কতটা ভাল হতে পারে? স্বাধীনতার ছত্রিশ বছরের মধ্যে সাড়ে পঁচিশ বছর তো এই শ্রেণীর হঠাৎ গজিয়ে ওঠা রাজনীতিবিদরাই দেশ চালিয়েছে–কি দিয়েছে দেশকে আর নিজেরা কি নিয়েছে দেশ থেকে। আসুন-না তার একটা হিসেব হয়ে যাক। তাহলেই তো সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আদর্শে বিশ্বাসী রাজনীতিবদদের জন্য রাজনীতি করা কঠিন করে দেয়া হচ্ছে। আর এ কারণে সুবিধাবাদী, তোষামোদি, খোসামোদিদের প্রাধান্য বাড়ছে। ত্যাগ নয়, ভোগের মানসিকতা নিয়ে রাজনীতিতে অবতরণ করেই জনগণকে শোষণ করা হচ্ছে। যে কারণে স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পরও দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেনি। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ধনী থেকে আরও ধনী হয়েছে, সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। যদি আদর্শবাদী রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় থাকতে পারত তাহলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হতে পারত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা যদি না ঘটত আর বঙ্গবন্ধু যদি পাঁচটা বছর হাতে সময় পেতেন তাহলে বাংলাদেশ পৃথিবীর জন্য উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করত। অর্থনৈতিক সমীক্ষা করেই এ তথ্য পাওয়া যায়। অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের রাজনৈতিক নেতা হবার ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে দেশের ও দেশের মানুষের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে বার বার।

শুধু দুর্নীতি লুটপাটই হয়নি, ভয়াবহ ভেজাল এদেশের মানুষের ভবিষ্যত অন্ধকার করে দিয়েছে। একটা জাতি যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হয় তাহলে এদেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম শারীরিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাবে। বিদেশে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য অখাদ্য হিসাবে নষ্ট করে ফেলার জন্য চিহ্নিত করা হয় সেগুলোই আমদানি করে আমাদের দেশের মানুষকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। মানুষের সর্বনাশ করা হচ্ছে। গত পাঁচ বছর যে কি ভয়ঙ্করভাবে জনগণের সর্বনাশ করে কিছু ক্ষুদ্রগোষ্ঠী অগাধ টাকার মালিক হয়েছে তা দেখে আঁতকে উঠতে হয়।

একটি ঘটনা পত্রিকায় দেখলাম। ইদানীং ধরা পড়েছে ত্রাণ ভাণ্ডারের টিন ও কম্বলসহ শীতবস্ত্র। বিএনপির নেতাদের কাছ থেকে এসব উদ্ধার করা হয়। এরা এত বেপরোয়া হয়ে দুর্নীতি করতে সাহস পেয়েছে তার কারণ কি? কেউ যখন এদের গালি দিচ্ছে তখন রাজনীতিবিদ হিসাবে দিচ্ছে আর তার কারণে যারা দেশপ্রেমিক ত্যাগী মনোভাব নিয়ে রাজনীতি করে তাদেরও গালি খেতে হচ্ছে। এটা তো করলে চলবে না–ত্রাণ ভাণ্ডারের টিন যে কারখানায় ব্যবহার করা হয়েছে এবং কম্বল পাওয়া গেছে তার পার্টনার কিন্তু মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানেরই পরিবারের সদস্য। যিনি অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন আর তার পরিবার এখনও সেনানিবাসে বসবাস করে। আর এ কারণেই কিন্তু এত বেপরোয়া হতে পেরেছে। জবরদখল করে ক্ষমতা পাওয়া গজিয়ে ওঠা রাজনীতিবিদ বলেই চুরি করার সাহস পাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, গালি খেতে হয় রাজনীতিবিদদের। এরা কি রাজনীতিবিদ?

শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর সন্তান হওয়ার কারণে নামে-বেনামে তারেক ও কোকো কিভাবে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে যায়? ভাই, বোন, বোনের ছেলেমেয়ে হওয়ার সুবাদে পাঁচ বছরেই দেশে বিদেশে বাড়ি, গাড়িসহ বিশাল সম্পদের মালিক হয়েছে। কিভাবে সম্ভব পাঁচ বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়া? ঢাকঢোল পিটিয়ে যে ভাঙা স্যুটকেস আর ছেঁড়া গেঞ্জির মিথ্যা প্রচার করা হয়েছিল তার ভেতরে এমন কী আলাদিনের চেরাগ ছিল? আমার কল্পনাতেও আসে না, রাতারাতি ১৬টি শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মালিক এরা কীভাবে হয়ে যায়? বিদেশে টাকা পাচার, সফরের সময় শতাধিক স্যুটকেস এবং বেনামেও যে কত সম্পত্তি করেছে কে জানে?

শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর প্রিয়ভাজন ও কাছের মানুষ হওয়ার কারণে ফুট-ফরমাশ খাটা কেউ একজন হুট করেই দেশের মিডিয়া টাইকুন হয়ে যায় এই গ্রহে, শুধুমাত্র বাংলাদেশেই গত ৫ বছরে তা সম্ভব হয়েছে।

যারা একদিন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে রিলিফ চুরির অপবাদ দিতে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছিলেন তারা কি এখনও প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ভাণ্ডারের রিলিফ চুরির দোষ সব রাজনীতিবিদদের উপর চাপাবেন? নাকি দয়া করে বলবেন যে, জাত যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে। চোরের নজর গাঁটের দিকে বলেই এত হাজার কোটি টাকার মালিক হওয়ার পরেও এরা রিলিফের টিন, কম্বল, শাড়ি-লুঙ্গির লোভ ছাড়তে পারে না।

দুর্ভাগ্য হলেও সত্য, (১৯৯৬-২০০১) যে পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে যেটুকু এগিয়ে নিয়েছিলাম দেশকে, পরবর্তী পাঁচ বছরের (২০০১-২০০৬) দুর্নীতি সন্ত্রাস লুটপাট পূর্বের অগ্রযাত্রা শুধু থামিয়েই দেয়নি, বরং পিছনে টেনে নিয়েছে। আর ঢালাওভাবে সমালোচনা করতে গিয়ে অর্জনটুকুও হারিয়ে গেছে। অন্যের অপরাধের বোঝার দায়ভাগ আমরা কেন বহন করব? সত্য কথা বলার সৎসাহস কি কেউ দেখাতে পারবে না? ২০০১ থেকে ২০০৬ আওয়ামী লীগ তো ক্ষমতার বাইরে ছিল, যদি কোন অনিয়ম হয়ে থাকে, যদি তেমন কোন দোষ পেত তাহলে কি বিএনপি সরকার ছেড়ে দিত? তন্ন তন্ন করে তো তারা খুঁজেছে। জেল দিয়েছে নির্যাতন করেছে এতটুকু ছাড় তো দেয়নি। দেশে বিদেশেও তদন্ত করেছে। কী পেয়েছে? পেলে কী ছেড়ে দিত? শেষ পর্যন্ত গ্রেনেড মেরেও হত্যার চেষ্টা করেছে। সংসদ সদস্যসহ ২৬ হাজার মানুষ হত্যা করেছে কিন্তু তার কোন বিচার হয়নি, তদন্ত হয়নি।

আর কত পরীক্ষা দিতে হবে?

তেলা মাথায় তেল না দিয়ে গরিবের পক্ষে কথা বলা, কাজ করাই বোধহয় আওয়ামী লীগের অপরাধ। চোরদের সঙ্গে দয়া করে কেউ তুলনা করবেন না, খুবই কষ্ট হয়। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে চাই না। সততা ও জনগণের ওপর বিশ্বাসই আমার রাজনীতির একমাত্র ভরসা। আমি সব সময় বিশ্বাস করি আল্লাহ পরীক্ষা নেন এবং সৎ মানুষের সঙ্গে থাকেন। তাই আমরা জোর করে বলতে পারি সত্যের জয় হবেই। ইদানীং একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। দুই নেত্রী। সব সমস্যা নাকি দুই নেত্রীকে নিয়ে। আবার আরও কথা হয় পরিবারতন্ত্র। আইনজীবীর সন্তান যদি আইনজীবী হয় তাহলে কি তা পরিবারতন্ত্র হবে? তা যদি না হয় তাহলে রাজনীতির ক্ষেত্রে কথা উঠবে কেন?

দুই নেত্রী নিয়ে কথা হয় এবং একশ্রেণী তো রাজনীতির সব সমস্যা চিহ্নিত করেছেন দুই নেত্রীর কারণে? এখানে যদি দুই পুরুষ দুই দলের নেতা হতো তাহলে কি প্রশ্ন দেখা দিত? এটা কি পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষ নেতৃত্ব পাচ্ছে না বলে কোন গ্লানি অনুভব করছে? আর সেই ব্যর্থতা ঢাকার প্রয়াস! জনগণ যাকে গ্রহণ করবে সেই তো নেতা হবে। কেউ যখন তুলনা করেন দুই নেত্রী বলে তাদের অনুরোধ করব পুরোপুরি তুলনা করুন না কেন? শিক্ষা, দীক্ষা, চালচলন, সাজপোশাক, দল পরিচালনা, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে একটা তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরুন।

পাঁচ বছরে খাদ্য উৎপাদন ১ কোটি ৯০ লাখ মে. টন থেকে ২ কোটি ৭০ লাখ মে. টনে বৃদ্ধি করেছিলাম। যা আগের তুলনায় ৮০ লাখ মে. টন বেশি। তেমনি বিদ্যুত ১৬০০ মে. ওয়াট থেকে ৪৩০০ মে. ওয়াটে (ক্যাপটিভ জেনারেটরসহ) উন্নীত করি। শিক্ষার হার ৪৬% থেকে বেড়ে ৬৬%-এ উন্নীত হয়। প্রবৃদ্ধি ৬.৬% হয়। মূল্যস্ফীতি ৬.৪ থেকে কমিয়ে ১.৫৯ ভাগে নামিয়ে আনা হয়েছিল। দারিদ্র্য বিমোচন ১.৫২ হারে করা হয়েছে, যা বর্তমানে .৪৮ হারে নেমে এসেছে। অর্থাৎ দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, চিহ্নিত কয়েকজনের মধ্যে পয়সা ভাগাভাগি হচ্ছে। চাল ডাল তেল লবণ ও সার বিতরণে কোন অনিয়ম ছিল না। জিনিসের দাম পাঁচ বছর স্থিতিশীল রেখেছিলাম– যদি দুর্নীতি করতাম তাহলে কি এটা সম্ভব হতো? হতো না। বেসরকারী খাতে টেলিভিশন, রেডিও, বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র, মোবাইল ফোন, বিমান ছেড়ে দিয়েছিলাম। ১৯৯৮ সালের তিন মাসব্যাপী ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলা, ত্রাণ-বিতরণ, কোন ক্ষেত্রে কেউ দুর্নীতির অভিযোগ আনতে পারেনি। এক পাল্লায় ফেলার আগে এ বিষয়গুলো নিয়ে সত্য বলবেন এটা আশা করি। বিমান বাহিনীর জন্য আটখানা মিগ-২৯ বিমান ১১৯ মি. মা. ডলার দিয়ে কিনেছি টেন্ডারে দাম উঠেছিল ২৮৯ মি. মা. ডলার। ১৭০ মি. মা. ডলার বাঁচিয়েছি। তেমনি ফ্রিগেট ১০৪ মি. মা. ডলার থেকে কমিয়ে ৯৯ মি. মার্কিন ডলার দিয়ে কিনে দেশের টাকা বাঁচিয়েছি–কমিশন খাওয়ার রাজনীতি করিনি! দয়া করে দুই জনকে এক পাল্লায় ফেলে একজনের সফলতাকে ম্লান করা আর অপরজনের ব্যর্থতাকে ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করবেন না। পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলাম, রাষ্ট্র পরিচালনায় সফলতাই বেশি দেখাতে পেরেছি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুর অধিকার, দারিদ্র্য বিমোচন, বিদ্যুত, খাদ্য ও কৃষি, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ইত্যাদি যা যা আজ জনগণ হাতে পাচ্ছে বা ভোগ করছে তা ১৯৯৬-২০০১ সালের শাসনকালেই পেয়েছে। তাহলে ব্যর্থতা কোথায়? ২০০১-২০০৬ সালে কি পেয়েছেন তুলনামূলক হিসাবটা বের করুন। সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি, কালো টাকা, দখল, ভেজাল, নকল, দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, বোমা, গ্রেনেড, নারী ধর্ষণ, গণপিটুনি, ক্রসফায়ার–লাশ, অনিশ্চয়তা, উদ্বিগ্নতা ছাড়া আর কী পেয়েছে মানুষ?

আমার বড় ফুফুর বিয়ে হয় দত্তপাড়া, শিবচর, মাদারীপুর। তাঁর দেবর বাদশা মিয়া সংসদ সদস্য ছিলেন ১৯৪৬ সালে। তাঁর ছেলে ইলিয়াস আহম্মদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং ভাল ক্রীড়াবিদও ছিলেন। ১৯৭০, ১৯৭৩ ও ১৯৯১ সালে সংসদ সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে লিটন চৌধুরী ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ সালে সংসদ সদস্য ছিলেন। ছয় বার সংসদ সদস্য এই পরিবার এখন পর্যন্ত ঢাকায় ভাড়াবাড়িতে থাকে কোন বাড়ি নেই। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুজিব বাহিনীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। খুলনায় ব্যবসা ছিল। তাঁর বার্জ ও কার্গো পাকিস্তানী হানাদাররা ক্ষতিগ্রস্ত করে। ঢাকায় ফিরে ইচ্ছা করলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিনে নিতে পারতেন, নেননি। ঢাকায় বাড়িও নেই। দত্তপাড়া তাদের গ্রামের বাড়ি ১৯৭১ সালে পুড়িয়ে দেয়া হয়।

আমার মেজ ফুফুর টুঙ্গীপাড়ায় বিয়ে হয়। শেখ ফজলুল হক মনির মা। ফুফাজান সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে আমাদের এলাকায় মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বিএ পাস করেন। ১৯৭১ সালে তাঁর বাড়িও পুড়িয়ে দেয় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী। শেখ মনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬১ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন। ১৫ আগস্ট তাঁকে ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাঁর এতিম দুই শিশুপুত্র রেখে যান। তারা বড় হয়েছে বিয়ে করেছে। ঢাকায় কোন বাড়ি শেখ মনি করে যায়নি বা পরিত্যক্ত বাড়িও কিনেনি। ছেলেরা এখনও ভাড়াবাসায় থাকে।

আমার সেজ ফুফুর বরিশালে বাড়ি। ফুফা আবদুর রব সেরনিয়াবাত আইনজীবী ছিলেন। ১৯৭০ ও '৭৩ সালে সংসদ সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেন। তাঁর ছেলে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ মুক্তিযোদ্ধা, বরিশালে পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ১৯৯১, ১৯৯৬ সালে সংসদ সদস্য ছিলেন। ১৯৭১ সালে বরিশালের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। ঢাকায় কোন পরিত্যক্ত বাড়ি কিনেননি। চার বার সংসদ সদস্যপদ এই পরিবার পেয়েছে। রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি করার জন্য যে জাতীয় কমিটি করা

হয়েছিল তার চেয়ারম্যান ছিলেন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ হিসেবে। কলাবাগানে একটা বাড়িতে থাকেন। গুলশান বারিধারার অভিজাত এলাকায় স্থান করে নিতে পারেননি। ১৯৭৫ সালে ঘাতকরা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর মেয়ে বেবী, আরজু, ছেলে আরিফ, ভাইয়ের ছেলে শহিদ ও রিন্টুকে হত্যা করে। হাসনাতের ছেলে সুকান্ত চার বছর বয়স, তাকেও গুলি করে হত্যা করে। আমার ফুফু, তাঁর ছেলেমেয়েরা– খোকন, বিউটি ও রীনা এবং হাসনাতের বউ সাহানা গুলিবিদ্ধ হয় মিন্টু রোডের বাসায়।

আমার ছোট ফুফু গোপালগঞ্জের মুকসেদপুরে বিয়ে হয়। ফুফা সাইদ হোসেন সাহেব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে মাস্টার্স পাস করে সরকারী চাকরিতে যোগ দেন। যেহেতু আমার আব্বা আইয়ুববিরোধী আন্দোলন করতেন সে কারণে তিনি চাকরিতে প্রমোশন পেতেন না। তাছাড়া তাঁকে হয়রানিমূলক বদলি করা হতো। মাগুরা-হবিগঞ্জ-ঠাকুরগাঁও-রামগড়-রংপুর-সিলেট-ময়মনসিংহ-রাঙ্গামাটি–বলতে গেলে আমার ফুফাত ভাইবোনেরা এক স্কুলে পড়ত তো অন্য স্কুলে গিয়ে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হতো। এভাবে কোথাও দশ মাস কোথায় ছয় মাস এভাবেই হয়রানির শিকার হয়েছে। তাঁর ছোট মেয়ে রোজীকে ১৯৭৫ সালে গুলি করে হত্যা করা হয়। আমার ফুফুকে তিন মাস গৃহবন্দী করে রাখে। ফুফা দুই বছর কারাগারে বন্দী থাকেন। আমার বাবার একমাত্র ভাই শেখ নাসের। খুলনায় ব্যবসা করতেন, সক্রিয় রাজনীতি করতেন না। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। একটা পা পঙ্গু ছিল। এ অবস্থায়ও গানবোটে করে সুন্দরবন এলাকায় মেজর জলিলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নেন। শেখ জামালও একই সেক্টরে যুদ্ধ করে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেও ঢাকায় কোন পরিত্যক্ত বাড়ি ক্রয় করেননি বা কোন ইন্ডাস্ট্রির মালিক হননি।

আমার ভাই ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ও লে. শেখ জামাল দু'জনই কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ছিল। কামাল কর্নেল ওসমানীর এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। ২১ নবেম্বর ১৯৭১ সালে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার পর যখন ওসমানী সেনাপতির দায়িত্ব নেন তখন দেশে ফিরে আসার পর ইচ্ছা করলে বাড়ি, ইন্ডাস্ট্রিসহ বহু কিছুরই মালিক হতে পারত কামাল ও জামাল। তারা কিন্তু তা করেনি। কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে পড়াশোনা শুরু করে।

জামাল ঢাকা কলেজে পড়াশোনা করে। যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি মার্শাল টিটো ঢাকা সফরে আসেন, তিনি জামালকে যুগোস্লাভিয়া থেকে পড়াশোনা ও ট্রেনিং দেবেন বলে দাওয়াত দিলে জামাল সেখানে যায়। কিন্তু ভাষার অসুবিধার কারণে প্রেসিডেন্ট টিটোর পরামর্শে ইংল্যান্ডে সেগুহার্স মিলিটারি একাডেমিতে ভর্তি হয়। ভর্তির আগে জামাল নিজের খরচ চালানোর জন্য লন্ডনে সেলফরিজ দোকানে সেলসম্যানের চাকরি নেয়। পিতা যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছেলে তখন সেলসম্যানের চাকরি করত নিজের পড়ার খরচ যোগাড় করতে। আমাদের বিবেকবানরা কি দয়া করে এটা তুলনা করবেন বর্তমানের সঙ্গে? পড়া শেষ করে বাংলাদেশে আসে এবং বাংলাদেশ আর্মিতে যোগদান করে। ছয় মাসের একটা ট্রেনিংয়ে যাওয়ার কথা ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কামালকে তাঁর স্ত্রী সুলতানাসহ এবং জামাল ও তার স্ত্রী পারভীনকে হত্যা করে ধানমণ্ডি ৩২ নং বঙ্গবন্ধু ভবনে।

প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির ছেলে হিসাবে কোন ইন্ডাস্ট্রি বা বাড়ি কিছুই করেনি। শেখ কামাল আবাহনী ক্রীড়াচক্র প্রতিষ্ঠা করে রেখে গেছে। সম্পদ বলতে রেখে গেছে তার সেতার আর ক্রিকেটের ব্যাট।

আমার স্বামী আণবিক শক্তি কমিশনে চাকরি করতেন। সীমিত আয়ের মধ্যে দিয়ে চলতে হতো। প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে হিসাবে কয়েকটি বাড়ি, শিল্প কলকারখানাসহ অনেক কিছুরই মালিক হতে পারতাম যদি ইচ্ছা করতাম। সে ইচ্ছা কখনই করিনি। কিন্তু দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন জাতি হিসাবে মর্যাদা পেয়েছি, মনটা তাতেই ভরে ছিল। বরং আমাদের চেয়েও কষ্টে কারা আছে তাদের কীভাবে সাহায্য করব সেই চিন্তাই ছিল। কখনও নিজে সম্পদের মালিক হব এই লোভলালসা আমাদের গ্রাস করেনি, একটা নীতি আদর্শ নিয়ে আমরা বড় হয়েছি। বাবা-মা আমাদের সেই শিক্ষা দিয়েছেন। আমার বাবা বলতেন, সব সময় নিচের দিকে তাকিয়ে চলবে। তোমার থেকে কে বেশি কষ্টে আছে তাই দেখবে, তাহলে বুঝবে তুমি কেমন আছ?

আমি পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলাম। আমার ছেলেমেয়ে, বোন শেখ রেহানা, তার ছেলেমেয়েরা সকলকেই এই নীতি ও আদর্শ শিক্ষা দিয়েছি। তাই প্রধানমন্ত্রীর বোন, এখনও লন্ডনে বাসে চড়ে অফিস করে। চাকরি করে খায়। একখানা গাড়িও কিনতে পারিনি। জয়, পুতুল, ববি, টিউলিপ চার ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখেছে, মানুষ হয়েছে। চাকরি বাকরি করে খাচ্ছে। ওদের লোভলালসায় পেয়ে বসেনি। অনন্ত সন্তানদের নিয়ে কোন বদনাম শুনতে হয় না। মানুষের মতো মানুষ হয়েছে। আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শোকরানা আদায় করি। আর দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই।

এবার তুলনা করুন বিএনপি-জামায়াতের এমপি মন্ত্রী ও তাঁদের সন্তানদের ক্ষমতায় থাকার আগে কি সম্পদ ছিল আর এখন কত সম্পদের মালিক। রাতারাতি ২০-২৫টি শিল্পকারখানার মালিক, হাজার হাজার একর জমি স্বনামে-বেনামে। পত্রিকার মালিক, প্রাইভেট টিভি চ্যানেলের মালিক, কোন্ সৎপথের কামাই থেকে করেছে? প্রাইভেট টিভি রেডিও চ্যানেল আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন মন্ত্রী, এমপিরা মালিক হতে পারেনি। আমাদের পরিবারের কেউ তা করতে পারেনি কারণ টাকা ছিল না। জিয়া পরিবারই ২/৩টি চ্যানেলের মালিক হয়েছে। একবার ক্ষমতায় গিয়েই এত সম্পদ বানিয়েছে যা শুনলে মাথা ঘুরে যায়।

আমার বাবা ১৯৫৪ সালে মন্ত্রী ছিলেন। আমরা ৩ নম্বর মিন্টু রোডে থাকতাম। ১৯৫৬ সালে আবার মন্ত্রী হন। ১৫ নং আব্দুল মতিন রোডে বাসা ছিল। এর পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ভাগ্য গড়ার চিন্তাও আমরা কখনও করিনি। তাই আমাদের সম্পর্কে অনেক অপপ্রচারও করা হয়েছে। এখনও সে প্রক্রিয়া চলছে। ১৯৭৫ সালে যখন পরিবারের সকলকে হত্যা করা হলো তখন তো রেডিও-টেলিভিশনে বার বার প্রচার করা হয়েছিল দেশে-বিদেশে কি কি সম্পদ আছে খুঁজে বের করা হবে এবং খোঁজাও হয়েছিল। কি পেয়েছিল? কিছুই তো পায়নি। ধানমণ্ডি ৩২ নং সড়কের বাড়ি (নতুন ১১) জনগণের জন্য আমরা দুই বোন দান করে দিয়েছি–একবার গিয়ে দেখে আসুন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। যিনি জাতির পিতা, যিনি স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, সারাটা জীবন জেলখানায় কাটিয়েছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন, মিথ্যা মামলায় হয়রানি হয়েছে তবুও সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন। তাঁর জীবনযাত্রা দেখুন আর এর পরবর্তী সময়ে যারা ক্ষমতাসীন হয়েছে তাদেরও বাড়িঘর সম্পদের হিসাব নিয়ে তুলনা করুন তফাৎটা চোখেই দেখবেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যখন সকলকে হত্যা করা হয়েছিল তখন তো কোন দলিলপত্র, কাগজপত্র বা গয়নাগাটি কিছুই তো সরাতে পারেনি সবাই তো সেনাবাহিনীর হাতে ছিল। সবই তো তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছিল। তদানীন্তন সরকার দেশে-বিদেশে তদন্ত করে কি পেয়েছিল? কিছুই না, অথচ কত অপপ্রচার, ১৯৭৩ সাল থেকে শুরু হয়েছিল এই অপপ্রচার বঙ্গবন্ধুর সরকারের বিরুদ্ধে। একটি স্বাধীন দেশের ভিত গড়ে তুলতে তিনি তো পরিশ্রম কম করেননি।

১৯৯৬ সালে আমি সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলাম। আমি মাত্র একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই তাহলো বেসরকারী খাতে বিদ্যুত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আইন আমি করেছিলাম এবং বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপন করি। আমাদের সরকারের আমলে যে কম দামে বিদ্যুত কেনা চুক্তি হয় সেই রকম কম দামে কি আর কেউ বিদ্যুত ক্রয় করতে পারবে? এক সেন্ট বাড়ালেই তো ভাল কমিশন পাওয়া যেত কিন্তু দেশের জনগণের অর্থ রক্ষা করার চেষ্টা করছি এবং করেছিও। কিন্তু অর্থ তো লুট করে খেল বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। আমার বিবেক তো পরিষ্কার যে কোন অন্যায় করিনি, অনিয়ম করিনি–অন্তত কেউ অর্থ আত্মসাতের কথা বলতে পারবে না। চোর বা চোরের মা তো কেউ বলতে পারবে না। এটাই তো বড় পাওয়া। তাই আবারও অনুরোধ করব, কোন একটা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ঢালাওভাবে এক পাল্লায় ফেলবেন না। চোরকে চোর বলেন, সাধুকে সাধু বলেন। সাদাকে সাদা বলেন, কালোকে কালো বলার সৎসাহস দেখান, সেটাই হলো বিবেকের কথা। বিবেক জাগ্রত করুন। তাহলে সততারই জয় হবে। মিথ্যার আশ্রয় নিলে মিথ্যাবাদীরাই উৎসাহিত হবে এবং অনিয়ম বাড়বে। দোষী ও নির্দোষকে একসঙ্গে দোষারোপ করলে দোষীরাই উৎসাহিত হয়। এখানে ব্যালান্স করার ব্যর্থ প্রয়াস না করাই উত্তম।

আত্মীয়স্বজন নিয়েও কথা ওঠে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে আমাদের পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে অধিকাংশ পরিবার রাজনীতিতে সক্রিয় ছিল। ছাত্রজীবন থেকে যে যেখানে পড়াশোনা করেছে রাজনীতির সঙ্গেও তারা জড়িত ছিল। আমাদের গ্রাম টুঙ্গীপাড়া, পাটগাতি ইউনিয়ন ছিল। গোপালগঞ্জ মহকুমা, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। আমার আব্বার দাদা (আমার দাদার চাচাতো ভাই) শেখ আবদুর রশীদ এবং তাঁর ছেলে খান সাহেব শেখ মোশাররফ হোসেন ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন ব্রিটিশ আমল থেকেই। খান সাহেব উপাধিও পেয়েছিলেন উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজের জন্য। খান সাহেব শেখ মোশাররফ হোসেন ১৯৬৫ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারত চলে যান। ১৯৭১ সালে তাঁর বাড়িঘর পাকিস্তানী সেনারা পুড়িয়ে দেয়। ঢাকায় কোন বাড়ি নেই। পরিত্যক্ত সম্পত্তি নেননি। ইন্ডাস্ট্রির মালিকও হননি।

১১.০২.২০০৭

‘আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়’

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

লন্ডনে বসবাসকারী সাহিত্যিক এবং কলাম-লেখিকা মাসুদা ভাট্টি আমাকে টেলিফোনে একটি মজার খবর দিয়েছেন। ড. মুহাম্মদ ইউনূস মাত্র চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরে তার পরিকল্পিত রাজনৈতিক দলটির জন্য যে নাম বিবেচনা করছেন সেটি প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিকের কাছে বলেছেন, তার দলের নাম হতে পারে ‘নাগরিক শক্তি’। এই নাম সম্পর্কে ঢাকার মানুষের প্রতিক্রিয়া কি তা আমি এখনো জানতে পারিনি। কিন্তু মাসুদা জানতে পেরেছেন। ঢাকার সঙ্গে তার প্রাত্যহিক যোগাযোগ আমার চাইতে অনেক বেশি।

মাসুদা ভাট্টি আমাকে জানালেন, ঢাকার একশ্রেণীর শিক্ষিত লোকের মধ্যে ড. ইউনূসের দলের প্রস্তাবিত নাম নিয়ে নাকি রীতিমতো রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। ঢাকার লোকজন খুবই রসিক। ভালোমন্দ সব কিছু নিয়েই তারা রসিকতা করতে ভালোবাসেন এটা জানি। আবার এই রসিকতার মৌলিক চিন্তাভাবনার পরিচয় থাকে, এটাই বিস্ময়কর। তাই মাসুদা যখন বললেন, ড. ইউনূসের রাজনৈতিক দলের প্রস্তাবিত নাম নিয়ে ঢাকায় রসিকতা শুরু হয়ে গেছে, তখন এই রসিকতাটা কি তা জানতে চাইলাম। মাসুদা বললেন, ঢাকার লোকজন ঠাট্টা করে এই নাম সংক্ষেপ করে রেখেছে “সর্বনাশ”।

নাগরিক শক্তির সংক্ষিপ্তকরণ কি করে ‘সর্বনাশ’ হয় তা জানতে চাইলে মাসুদা জানালেন, ঢাকায় যারা এই সংক্ষিপ্তকরণের কাজটি করেছেন তাদের ব্যাখ্যা হলো, ড. ইউনূসের দলে তো দেশের ডান-বামের সকল দল থেকেই অনেক নেতাকর্মী গিয়ে যোগ দেবেন। যেমন এরশাদ জাতীয় পার্টি গঠন করার সময় ডানপন্থী-বামপন্থী সকল দল থেকেই অনেক নেতাকর্মী গিয়ে সেই দলে জুটেছিলেন। সুতরাং ড. ইউনূসের দলটিকেও বলা চলবে “সর্বদলীয় নাগরিক শক্তি” এখন সর্বদলীয় থেকে ‘সর্ব’ নিলে এবং নাগরিক থেকে ‘না’ এবং শক্তি থেকে ‘শ’ নিলে সংক্ষেপে দলটির নাম দাঁড়ায় ‘সর্বনাশ’।

মাসুদা ভাট্টির কাছ থেকে কথাটা শুনে ঢাকায় যারা ড. ইউনূসের পরিকল্পিত রাজনৈতিক দলের নামের এমন চমৎকার সংক্ষিপ্তকরণের কাজটি করেছেন তাদের উদ্ভাবনী প্রতিভার তারিফ না করে পারিনি। আমি আবার ঢাকায় আমার এক সাংবাদিক বন্ধুকে মাসুদার কাছ থেকে শোনা খবরটা জানাতেই তিনি বললেন, খবরটা তারাও জানেন এবং তাদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের গানের একটি কলি এখন গুনগুনিয়ে গাইছেন। গানের কলিটি হলো ‘আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।’ বন্ধুর কথা শুনে মনে হলো নোবেল লরিয়েট রবীন্দ্রনাথ আজ বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের আরেক নোবেল লরিয়েট ড. ইউনূসকেই হয়তো তার এই গানটি একটু অদল-বদল করে উৎসর্গ করতেন।

আমি বাংলাদেশ থেকে বহু দূরে লন্ডনে থাকি। কিন্তু মাসুদা ভাট্টির খবরটা জানার পর আমিও গুনগুন করে গাইছি “আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।” এই সর্বনাশের সূত্রপাত কিভাবে হবে, তার থাবা কতোদূর পর্যন্ত এগুবে তা এখনো জানি না। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরে নোবেল বিজয়ী হবু রাজনীতিক বলেছেন, তিনি তার রাজনৈতিক দল গড়ার সিদ্ধান্ত থেকে আর পিছপা হতে পারেন না। ডাই ইজ কাস্ট। এখন ফেরেশতা সংগ্রহ শুরু হবে এবং এই ফেরেশতাদের নিয়েই শুরু হবে তার দল গঠন। তা আবার যেমন তেমন দল গঠন নয়। সংসদের তিন শ’ আসনেই তার দল প্রার্থী দেবে। এই সব প্রার্থী যারা হবেন ফুলের মতো পবিত্র চরিত্রের, সে কথা তিনি মুখ ফুটে না বললেও তার মনোভাব ও হাবভাব থেকেই বোঝা যায়।

আমার ঢাকার বন্ধুকে জিগ্যেস করেছিলাম, যিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার জয় করেছেন, তার দল গঠন করার মধ্যে আপনারা অশান্তি ও সর্বনাশের আভাস দেখছেন কেন? এই সর্বনাশ কাদের? তার নিজের, না তার প্রস্তাবিত দলের, না দেশের? বন্ধু বলেছেন দল, দেশ এবং তার নিজের জন্যও এই নতুন দল গঠন হবে সর্বনাশা। বন্ধু বলেছেন এই সম্ভাব্য সর্বনাশ তার দল, দেশ এবং নিজের জন্যও। ওজারতি আর তেজারতি এক সঙ্গে করতে চাইলে তার ফল ভালো হয় না। ড. ইউনূস অবশ্য বলেছেন, রাজনীতির জন্য তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবসা ছেড়ে দিতে রাজি আছেন। কিন্তু যার মধ্যে রয়েছে বংশানুক্রমিক তেজারতি বুদ্ধি ও চাতুরি; সেই বুদ্ধি ও চাতুরি দ্বারা ওজারতির রাজনীতি চালাতে গেলে আম ও ছালা দুই-ই খোয়া যেতে পারে।

বন্ধু তার কথার আরও ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। বলেছেন, অকালকুষ্মাণ্ড কথাটির অর্থ তো আপনি জানেন। পরিবারের কোনো ছেলে বখে গেলে তাকেও বলা হয় অকালকুষ্মাণ্ড। রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা দল হিসেবেও অকালকুষ্মাণ্ড জন্মাতে পারে। তার ফল ভালো হয় না। সেই দলও সাধারণত টিকে থাকে না। পাকিস্তানে জেনারেল আইয়ুব খান বন্দুকের জোরে ক্ষমতায় বসে কনভেনশন মুসলিম লীগ নামে

রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন। আইয়ুবের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যেতেই কনভেনশন মুসলিম লীগের কার্যত বিলুপ্তি ঘটে। আইয়ুব ক্ষমতা ছাড়ার পর নিজের বদলে আর কাউকে সারা পশ্চিম পাকিস্তান চষে খুঁজে পাননি তার দলের সভাপতি করার জন্য। শেষ পর্যন্ত দুর্নীতির দায়ে তার যে মন্ত্রীকে বরখাস্ত করেছিলেন চট্টগ্রামের সেই ফজলুল কাদের চৌধুরী বা ফ. কা. চৌধুরীকে (বর্তমানে দুর্নীতির অভিযোগে জেলে আটক সা. কা. চৌধুরীর বাবা) ডেকে নিয়ে কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি করেছিলেন। লোকে ঠাট্টা করে বলতো, কনভেনশন মুসলিম লীগের পতি ছিল, সভা আর ছিল না। অথচ আদি মুসলিম লীগ, যেটি কাউন্সিল মুসলিম লীগ নামে এক সময় পরিচিত হয়েছিল, সেটি এখনো টিমটিম করে টিকে আছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে জেনারেল এরশাদও ক্ষমতার ডাণ্ডা হাতে নিয়ে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন জাতীয় পার্টি নামে। তিনিও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন এবং কাজী জাফর, মওদুদ আহমদ প্রমুখ ফেরেশতাদের বিভিন্ন দল থেকে মন্ত্রিত্বের প্রলোভন দেখিয়ে নিজের দলে টেনে এনেছিলেন। এরশাদের ক্ষমতাচ্যুতির পর তিনি নিজেই হরেকরকম দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত হন এবং তার দলের অবস্থা এখন ত্রিভঙ্গ মুরারির মতো।

ঢাকার সাংবাদিক বন্ধুকে বলেছি, আপনার বিশ্লেষণের সঙ্গে আমি ভিন্নমত নই। কিন্তু ড. ইউনূস সামরিক শাসকদের কায়দায় রাজনীতিতে আসছেন না এবং সেই কায়দায় রাজনৈতিক দলও গঠন করছেন না। তিনি দেশের একজন নাগরিক হিসেবে নিজের রাজনৈতিক দল গঠন করবেন এবং সংসদের সকল আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছেন। সুতরাং তার দল আইয়ুব বা এরশাদের রাজনৈতিক দলের মতো অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে এ কথা কি বলা চলে?

বন্ধু বললেন, ড. ইউনূসের দলকে সামরিক শাসকদের কায়দায় গঠিত রাজনৈতিক দল বলা চলবে না এবং তার হাতে বন্দুকও নেই। কিন্তু যে কায়দায় রাজনৈতিক দল গঠন করে ক্ষমতায় বসতে চাইছেন, তা সামরিক শাসকদের কায়দার চাইতে উন্নত এবং চাতুরিপূর্ণ। সময়ের পরিবর্তনেই তাকে সামরিক শাসকদের কায়দাটা পরিবর্তন করতে হয়েছে। তবে স্লোগানটা একই রয়ে গেছে। এই স্লোগান হলো, দেশের রাজনীতি এবং রাজনীতিক সবই খারাপ। নতুন ধারার রাজনৈতিক দল করার সুযোগ এখনই। তিনি দরকার হলে গ্রামীণ ব্যাংকের মতো বিপুল মুনাফার ব্যবসা ছেড়ে রাজনীতিতে নামবেন।

সাংবাদিক বন্ধু বললেন, ড. ইউনুস যে বলেছেন, নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের এটাই মোক্ষম সুযোগ, এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, দেশে এখন জরুরি অবস্থা বহাল রয়েছে। প্রচলিত ধারার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখা হয়েছে। সুতরাং জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে তিনি 'নতুন ধারার' রাজনৈতিক দল গঠন করতে চান। কিন্তু এই নতুন ধারাটা কি তা ব্যাখ্যা করছেন না। সুতরাং সামরিক শাসকদের রাজনৈতিক দলগুলোকে যেমন বলা যেতো সামরিক শাসনের ফসল। তেমনি দেশে জরুরি অবস্থা চলাকালে ড. ইউনূস যে নতুন রাজনৈতিক দল করার উদ্যোগ নিয়েছেন তাকে বলা চলবে জরুরি অবস্থার ফসল (ট যরমঢলর্ড মত ঋবণরথণভডহ)।

আইয়ুব, জিয়াউর রহমান, এরশাদের মতো সামরিক শাসকেরা তাদেরই দ্বারা দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত রাজনীতিকদের জেল থেকে মুক্ত করে এনে বা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে নিজ নিজ দলের নেতা এবং সরকারের মন্ত্রী বানিয়েছিলেন। আইয়ুবের আমলে ফ. কা. চৌধুরী, সবুর খান এবং এরশাদের আমলে মওদুদ আহমদের কথা এই ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে। এখন দেখা যাক, ড. ইউনূস তার দলের জন্য কিংবা নির্বাচনে তার দলের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য কোথা থেকে ফেরেশতা সংগ্রহ করেন আরও দেখা যাক, আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা জাতীয় পার্টি ইত্যাদি দলে থাকার সময় ঢালাওভাবে যে রাজনীতিকদের দুর্নীতিবাজ বলা হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে, তারা সকলেই আদর্শহীন এবং টাকার জন্য রাজনীতি করেন, তাদেরই নিজ দলে টেনে এনে সৎ ও সুনীতিপরায়ণ রাজনীতিক বলে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় কিনা?

ঢাকার সাংবাদিক বন্ধুর এই বক্তব্যের জবাব ড. ইউনূস নিজেও দিতে পারবেন কিনা সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। তার পরিকল্পিত দলকে জরুরি অবস্থার প্রোডাক্ট বলা হলেও এই প্রোডাক্ট তৈরির পেছনে বর্তমান নির্দলীয় সরকারের সমর্থন বা সহযোগিতা আছে বা থাকবে বলে মনে হয় না। অবশ্য এই সরকারের গৃহীত জনসমর্থিত ব্যবস্থাগুলোর আড়ালে আশ্রয় নিয়েই ড. ইউনূস তার নতুন দল গঠনের চেষ্টা করছেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে দেশবাসীর মনে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করারও চেষ্টা করছেন যে, এই সরকারই যেন তাদের গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা দ্বারা ড. ইউনূসেরই নতুন দল গঠন ও দ্রুত তার ক্ষমতায় আসার পথ সুগম করে দিচ্ছেন।

আমার কানে এমন গুজবও এসেছে যে, বর্তমান সরকার বিপুলসংখ্যক রাজনীতিবিদকে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের দায়ে জেলে ঢোকাবেন এবং তিনশোর মতো রাজনীতিককে রাজনীতি ও নির্বাচন করার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করবেন। যেমন করেছিলেন আইয়ুব খান। তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, আইয়ুব খুরো, আতাউর রহমান খানসহ তখনকার অধিকাংশ প্রধান রাজনৈতিক নেতাকে এবডো (ঋঈউ) আইনে রাজনীতি করা, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন। ফলে তখনকার পাকিস্তানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রেডের বহু রাজনীতিক, যাদের কস্মিনকালেও মন্ত্রী, এমপি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তারা আইয়ুবের এবডো অর্ডিন্যান্স ও তথাকথিত বেসিক ডেমোক্র্যাসি প্রথার কল্যাণে সরকারি দলের নেতা, মন্ত্রী, এমপি ইত্যাদি হয়ে বসেন। এইভাবে ময়মনসিংয়ের বটতলার উকিল মোনেম খাঁ, রংপুরের কাজি কাদের, চট্টগ্রামের ফ.কা. চৌধুরী, খুলনার সবুর খানদের রাজনীতির শীর্ষস্থানে আরোহণ সম্ভব হয় এবং রাজনীতির স্ট্যান্ডার্ড-এর দ্রুত পতন ঘটে। রাজনীতি শাদা হওয়ার বদলে আরও কালো হয়ে ওঠে এবং দুর্নীতি আগের সরকারগুলোর আমলের চাইতে পঞ্চাশ গুণ বৃদ্ধি পায়। আইয়ুব আমলে রাজনীতিক নয়, তার সৃষ্ট বেসিক ডেমোক্র্যাট বা মৌলিক গণতন্ত্রী ও সিও-ডেভদের (সার্কেল অফিসার, ডেভেলপমেন্ট) দুর্নীতির কলঙ্ক অতীতের সকল দুর্নীতির কলঙ্ক ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

আমি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমন এবং সংস্কারমূলক কার্যক্রমগুলো এবং প্রশাসন ও রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন করার অভিযানের সাফল্য কামনা করি বলেই বিশ্বাস করি না যে, তারা আইয়ুব বা এরশাদের পথে যাবেন। কারণ, তাদের মধ্যে একজনও ক্ষমতালিপ্সু আইয়ুব, জিয়াউর রহমান বা এরশাদের আবির্ভাব এখন পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়নি। সামরিক বাহিনীও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অক্সিলিয়ারি ফোর্স হিসেবে আছে; তাদের হুকুমদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেনি। এজন্যেই ঢাকার এই গুজবটি বিশ্বাস করি না যে, বর্তমান সরকার শ'য়ে শ'য়ে রাজনীতিককে বাছাই করে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেবেন এবং ড. ইউনূস বা এই জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী কাউকে রাজনীতির খালি মাঠে নেমে বিনা বাধার গোল পোস্টে গোল ঢোকাতে দিবেন। কিংবা ক্ষমতায় বসার সুযোগ করে দেবেন।

আমার ধারণা যদি সঠিক হয়, তাহলে এ ধরনের কাজ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা সেনাবাহিনী কারোই এজেন্ডা নয়। তারা যদি কেবল দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদেরই নয়, সকল পেশার দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের, এমনকি সামরিক ও অসামরিক প্রশাসনের দুর্নীতিবাজদেরও ধরে বিচার ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন তাহলে দেশের মানুষের অব্যাহত সমর্থন ধরে রাখতে পারবেন। কোনো নির্দোষ ব্যক্তি বা পরিবার রাজনীতিক হলেও তারা যাতে অযথা হয়রানির শিকার না হন, সেদিকেও সরকারকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। একটা দেশে বা সমাজে

কেবল রাজনীতিকরাই খারাপ এবং তারাই দুর্নীতিবাজ এই থিয়োরি কপচিয়ে যারা নিজেরাই আবার রাজনীতিতে নামতে চান, তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বর্তমান সরকার সতর্ক থাকবেন বা আছেন বলে বিশ্বাস পোষণ করতে চাই।

ড. ইউনূস একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। তিনি রাজনীতিতে এসে যদি রাজনীতিকে পঙ্কিলতামুক্ত করতে চান তাহলে খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু সোজা ও স্বাভাবিক পথে রাজনীতিতে না এসে তিনি পানি ঘোলা করে রাজনীতিতে আসতে চান। এবং রাজনীতির মাঠে যে রাজনীতিকদের সাথে নীতি ও কর্মসূচীর প্রশ্নে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে, তাদের সম্পর্কে আগেই তিনি অসৎ, আদর্শহীন, টাকার জন্য রাজনীতি করছেন বলে ঢালাও ও প্রমাণহীন অভিযোগ তুলে নিজেকে নিজে একমাত্র সৎ বলে প্রমাণের চেষ্টা করছেন। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরে শেখ হাসিনার অভিযোগ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি কারো কথার উপর কথা বলতে চাই না। এটা কথা বলার সময় নয়। আমরা কি করতে চাই, তা কাজ করে দেখাতে চাই।"

তাই যদি হয় খুব ভালো কথা। তিনি কাজে নামার আগেই অন্যের দোষত্রুটি না খুঁজে রাজনীতিতে নিজেদের সততা, আদর্শ ও যোগ্যতার প্রমাণ দিন। জনগণের কাছে পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের কর্মসূচী তুলে ধরে তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করুন। সমর্থন পেলে ক্ষমতায় যান। কেউ তার বাড়া ভাতে ছাই দেবে না। দিতে চাইলেও দিতে পারবে না। কিন্তু তিনি সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ না ধরে বাঁকা পথে রাজনীতিতে নেমে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিকদের তার সুশীল সমাজ, অনুগত ("নিরপেক্ষ") মিডিয়া এবং নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে ডিসক্রেডিট করে দেশের অল-পাওয়ারফুল শাসক হতে চান এবং এ জন্যে জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাজনীতিতে নিরাপদ ল্যান্ডিংয়েরও চেষ্টা চালাচ্ছেন। এটা তো সৎ ও সুস্থ রাজনীতির পথ নয়।

দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে ১১ জানুয়ারি। এই ১১ জানুয়ারির আগে ড. ইউনূস যে কথা বলেছেন এবং ১১ জানুয়ারির পর যেসব কথা বলছেন তা একটু মিলিয়ে দেখলেই দেখবেন, তা পরস্পরবিরোধী কথা। ১১ জানুয়ারির আগে তিনি রাজনীতিতে নামতে ইচ্ছুক ছিলেন না, বরং রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনের সংবিধানবিরোধী ও গণবিরোধী সব অপকর্মে জোরালো সমর্থন দিয়েছেন। বিএনপি দেশবাসীর সম্মিলিত বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে ২২ জানুয়ারি সঠিক ভোটার তালিকাবিহীন এবং সর্বপ্রকার অনিয়মের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য গোঁ ধরেছিল। ড. ইউনূস 'মুক্তপুরুষ' সেজে তাতে ক্রমাগত সমর্থন যুগিয়েছেন। তার মতো নোবেল লরিয়েটের পক্ষে এই ধরনের দলীয় পক্ষপাতমূলক অবস্থান গ্রহণ মোটেই উচিত হয়নি।

ঢাকার একটি দৈনিকে (সাংবাদিক আসাদুজ্জামান কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত) ড. ইউনূসের এই ধরনের পরস্পরবিরোধী ও অসঙ্গতিপূর্ণ কথাবার্তার একটা তালিকা সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে। তার শিরোনাম হলো : "১১ জানুয়ারির আগে বলেছেন এক রকম, পরে আরেক রকম।" এই রিপোর্টটি পাঠ করলেই বোঝা যায়, নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পর "আনন্দের এভারেস্ট চূড়ায়" আরোহণের পর্যায়ে ড.ইউনূস রাজনীতিতে নামার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও পরে তা থেকে পিছিয়ে যান। কিন্তু ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশে আকস্মিকভাবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর রহস্যজনকভাবে ড. ইউনূসেরও মত বদলে যায়। তিনি ভারত সফরে গিয়েই রাজনৈতিক দল গঠনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। আর এখন তো দেশে বসে বলছেন, রাজনৈতিক দল গঠনের যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন তা থেকে আর পিছিয়ে আসবেন না। দল করলে বিতর্ক দেখা দেবে, সে ঝুঁকিও তিনি নিতে রাজি।

ঢাকার দৈনিকে প্রকাশিত ড. ইউনূসের ১১ জানুয়ারির আগের ও পরের বক্তব্যে দেখা যায়, ১৮ ডিসেম্বর প্যারিসে জর্নাল দি মসের সাংবাদিক ব্রুনা বাসিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে ড. ইউনূস বলেছেন, "রাজনীতিতে আসার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। বাংলাদেশের রাজনীতি বড় রূঢ় ও উগ্র প্রকৃতির।" এর আগে ১৩ ডিসেম্বর তারিখে স্টকহোমের সুইডিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রেস সেন্টারের সংবাদ সম্মেলনেও তিনি একই কথা বলেছেন। কিন্তু ১১ জানুয়ারির আকস্মিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরই তার কণ্ঠে শোনা গেল নতুন কথা। বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেশের রাজনীতিকদের উপর ঢালাও আক্রমণ চালান। সম্পূর্ণ আনপ্রোভোকড অবস্থায় ১৭ জানুয়ারি এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন, "বাংলাদেশের রাজনীতিকরা কেবল অর্থের জন্য রাজনীতি করেন। সেখানে কোনো আদর্শের বালাই নেই।"

এরপর এক মাস না যেতেই ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলকাতায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি জানালেন, 'তার নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ সমুপস্থিত।' ঢাকায় ফিরে বিমানবন্দরেই বললেন, প্রয়োজনে গ্রামীণ ব্যাংক ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে নামবেন। রাজনৈতিক দল করবেন। তার কথার ধরন দেখে মনে হতে পারে, রাজনীতি বুঝি গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়েও বড় মুনাফার ব্যবসা। দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হওয়ার পরই যে তিনি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যাপারে আগের অনিচ্ছা ত্যাগ করে হঠাৎ উৎসাহী হয়ে ওঠেন, তার ১১ জানুয়ারির আগের ও পরের কথাবার্তাগুলো মিলিয়ে দেখলেই তা বোঝা যায়।

এখন একটা ব্যাপার স্পষ্ট, জরুরি অবস্থা ঘোষিত হওয়ার পর যখন দেশে স্বাভাবিক রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ থাকার এবং রাজনীতিকদের রাজনীতি করা থেকে নিবৃত্ত থাকার কথা, সে সময়টাকে তিনি রাজনীতিতে নামার ও নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের মোক্ষম সময় বলে বেছে নিয়েছেন। নিজেই বলেছেন, তার জন্য রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ এখনই। এটা একজন সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তির কথা বলে বিবেচিত হবে, একজন প্রকৃত রাজনীতিকের কথা বলে বিবেচিত হতে পারে না।

তিনি হয়তো আরও ভেবেছেন, দুর্নীতির দায়ে যেভাবে রাজনীতিকদের ধরপাকড় করা হচ্ছে এবং খবরের কাগজে খবর বেরিয়েছে যে তিনশোর মতো রাজনীতিকের রাজনীতি করা নিষিদ্ধ করা হবে, তখন তো রাজনীতির মাঠ বলতে গেলে একেবারে খেলোয়াড় শূন্য হয়ে যাবে এবং তিনিই হবেন একমাত্র খেলোয়াড়। এই অবস্থায় বর্তমান সরকার দেশে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে তিনি সংসদের তিনশো আসনেই তার খুশি মতো– দরকার হলে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মচারীদের রাজনীতিক সাজিয়ে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিতে পারবেন। তারা জয়ী হলে তার অল পাওয়ারফুল রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হওয়া আর আটকায় কে?

ড. ইউনূস যে রাজনীতিকদের সঙ্গে অথবা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামতে ভয় করেন, তারা যদি এবডো বা অনুরূপ কোনো সরকারি বিধিনিষেধে রাজনীতি করতে বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারেন তাহলে তো আরও পোয়াবারো। তার দলের নির্বাচনে ভূমিধস বিজয় ঠেকায় কে? সম্ভবত গত ১১ জানুয়ারির পট পরিবর্তন– বিশেষ করে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হওয়ার পর নোবেল লরিয়েট ড. ইউনূস এই স্বপ্নেরই ফেরিওয়ালা হয়েছেন। তবে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি তার এই খোয়াবের নৌকা বাস্তবের তীরে ভিড়তে কিছুমাত্র সাহায্য জোগাবেন? ড. ইউনূস আশা করতে পারেন। কিন্তু আমার সন্দেহ আছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সেনাবাহিনী দেশটাকে গত পাঁচ বছরের অপশাসনের জঞ্জালমুক্ত করার পর নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের প্রকৃত ও সৎ জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বদলে একটি ভূইফোঁড় দল এবং তার অপরীক্ষিত নেতার হাতে, যিনি আবার দেশে বিতর্কিত ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত, ক্ষমতা তুলে দেওয়ায় আগ্রহী হবেন আমার পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন। তা ছাড়া ড. ইউনূস

যেমন দেশের ত্রাণকর্তা সাজতে চাইছেন, তাতে রাজনীতিকরা বাদ না সাধলেও রাজনীতির বাইরে থেকেও কেউ একই ত্রাণকর্তার ভূমিকাটি গ্রহণের জন্য উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠবেন না এবং ড. ইউনূসের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে খাড়া হবে না, তার গ্যারান্টিই বা কে দেবে?

তবে ড. ইউনূসের রাজনীতিতে নামার এবং নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার উদ্যোগের একটা আশাবাদী দিকও আছে। সেই দিক হলো, ড. ইউনূসের মতো একজন সুচতুর মানুষ যখন বাংলাদেশে একটি অনির্বাচিত সরকারের আমলে, যে সরকার কতোদিন ক্ষমতায় থাকবেন, তা এখনো স্পষ্ট নয়, রাজনীতিকের ড্রেস রিহার্সাল শুরু করেছেন, এমনকি রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য সন্তান প্রসবের আগেই নামকরণ করে ফেলেছেন, তখন বর্তমান সরকার যে তাদের প্রতিশ্রুতিমতো দেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন এবং রাজনীতিকদের হাতেই দেশের শাসনভার ফিরিয়ে দেবেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে; নইলে এতো আগে ড. ইউনূস রাজনীতিকের পাগড়ি মাথায় ধারণ করতেন না এবং সংসদের তিনশো আসনেই তার দলের প্রার্থী দেওয়ার কথা বলতেন না। কেবল বলছেন না তার রাজনৈতিক কর্মসূচী কী?

এখন প্রশ্ন হলো, দেশের মানুষ তাদের সকল কিছু নিয়ে "সর্বনাশের" আশায় বসে থাকতে পারে; কিন্তু ড. ইউনূসের স্বপ্নের তরী রাজনীতির বুড়িগঙ্গায় থই পাবে তো? কবিরা বলেন– "ধন্য আশা কুহকিনী...।"

লন্ডন ॥ ১৯ ফেব্রুয়ারি, সোমবার ॥ ২০০৭

[লেখক প্রবাসী সাংবাদিক ও কলামিস্ট]